মৃগাঙ্কবাবুর ঘটনা

boiRboi.net

মৃগাঙ্কবাবু তাঁর সহকর্মী সলিল বসাকের কাছ থেকে প্রথম জানতে পারলেন যে বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এ খবর আজকের দিনে শিক্ষিত লোক মাত্রই জানে, কিন্তু ঘটনাচক্রে খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর গোচরে আসেনি। আসলে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা নেহাৎই সংকীর্ণ। ইস্কুলে মাঝারি ছাত্র ছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনও বই পড়তেন না, পরেও বই পড়ার অভ্যাসটা একেবারেই হয়নি।

'বলেন কি মশাই! তাজ্জব ব্যাপার! বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে?' মৃগাঙ্কবাবু চরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'ঠিক তাই', বললেন সলিলবাবু, 'লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ছিল এক শ্রেণীর চতুষ্পদ বাঁদর। বাঁদর জাতটা অবিশ্যি এখনও আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে সে শ্রেণী লোপ পেয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু এবং সলিলবাবু দুজনেই হার্ডিঞ্জ ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানিগিরি করেন। মৃগাঙ্কবাবু বাইশ বছর হল কাজ করছেন, আর সলিল পনেরো; দুজনে পাশাপাশি টেবিলে বসেন, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, না হলে মৃগাঙ্কবাবু মোটেই মিশুকে লোক নন।

বানর থেকে মানুষ হওয়ার খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান ঘেঁটে একটা বিবর্তনের বই জোগাড় করে পড়ে ফেললেন। সলিল ভুল বলেনি। ছাপার অক্ষরে তথ্যটা দেখে মৃগাঙ্কবাবু আর সেটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আশ্চর্য—বানর থেকে মানুষের আসতে এত লক্ষ বছর লেগেছে! আদিম অবস্থাটা, এবং পরিবর্তনের ব্যাপারটা এখনও কিছুটা অন্ধকারে রয়েছে, তবে এ ব্যাপারে প্রাণিবিদ্‌রা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ ও বানর, এই দুই-এর মাঝামাঝি অবস্থাকে যে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক এ খবরও মৃগাঙ্কবাবু জানলেন।

কিন্তু এতেই মৃগাঙ্কবাবুর আশ মিটল না। তিনি প্রথমে যাদুঘর গেলেন আদিম মানুষের মূর্তি আর তার হাড়গোড় দেখতে। দেখে বুঝলেন যে আদিম দ্বিপদ মানুষের চেহারার সঙ্গে বাঁদরের চেহারার

boiRboi.net

বিশেষ মিল ছিল। তারপর মৃগাঙ্কবাবু গেলেন চিড়িয়াখানায়। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। এক হল লেজবিশিষ্ট 'মাঙ্কি', আর আরেক হল লেজবিহীন 'এপ'। এর মধ্যেও নানারকম শ্রেণী। দিশি বাঁদর আর হনুমানের বাইরে রয়েছে আফ্রিকার গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন ইত্যাদি, আর তাছাড়া আছে সুমাত্রার ওরাং ওটাং বা বনমানুষ। এই যে মানুষ কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এটা মৃগাঙ্কবাবুর কাছে খুব অর্থপূর্ণ বলে মনে হল।

তার আরও মনে হল যে সবরকম বাঁদরের মধ্যে আফ্রিকার শিম্পাঞ্জির সঙ্গেই মানুষের সবচেয়ে বেশি মিল। শুধু তাই না, একটি বিশেষ শিম্পাঞ্জি তো মৃগাঙ্কবাবুর সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী বলে মনে হল। বার বার তাঁর দিকে চাওয়া, এগিয়ে এসে খাঁচার শিক ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর

দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করা, এমন কী দাঁত বার করে হাসা পর্যন্ত। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছিল যেন জানোয়ারটিকে তিনি অনেকদিন থেকেই চেনেন।

চিড়িয়াখানায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মৃগাঙ্কবাবুর হঠাৎ কালুমামার কথা মনে পড়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবুর যখন বছর পঁচিশেক বয়স তখন কালুমামা একবার কিছুদিনের জন্য তাঁদের বাড়িতে এসে ছিলেন। তখন তিনি মৃগাঙ্কবাবুকে মাঝে মাঝে মর্কট বলে সম্বোধন করতেন। 'এই মর্কট, মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আন তো।'

মৃগাঙ্কবাবু একদিন না জিজ্ঞেস করে পারেননি। 'আচ্ছা কালুমামা, তুমি আমায় মর্কট বল কেন?'

কালুমামার উত্তর দিতে সময় লাগেনি।

'তোর চেহারাটা মর্কটের মতো তাই। আয়নায় নিজের মুখ দেখেও বুঝতে পারিস না? কপাল ছোট, কুৎকুতে চোখ, নাক অর ঠোঁটের মাঝখানে এত বড় ফাঁক—মর্কট বলব না তো কী বলব? তোর হাতের আংটিটায় যে 'এম' লেখা রয়েছে সেটা আসলে মৃগাঙ্ক নয়— ওটা মর্কট। অথবা মাঙ্কি। তোর আর চাকরি খুঁজতে হবে না— চিড়িয়াখানায় খাঁচায় তোর জন্য ভেকেন্সি রয়েছে সব সময়।'

মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি এর পরে আয়নায় নিজের চেহারাটা খুব ভালো করে দেখেছিলেন। কালুমামা খুব ভুল বলেননি। একটা বাঁদুরে ভাব আছে বটে তাঁর চেহারার মধ্যে। তখন মনে পড়ল ইস্কুলেও মহেশ স্যার তাঁকে 'এই বাঁদর, তোর বাঁদরামো থামা' জাতীয় কথা বলে ধমক দিতেন। তখন মৃগাঙ্কবাবুর বয়স বারো-তেরো। নিজের চেহারা যে বাঁদরের মতো হতে পারে এ খেয়াল তাঁর হয়নি।

শুধু মুখে নয়, পিঠে একটা কুঁজো ভাব, তার শরীরের লোমের আধিক্য— এ দুটোও তাঁকে কিছুটা বাঁদরের কাছাকাছি এনে দেয়। সলিলের কথাটা তাঁর আবার মনে পড়ল। সুদূর অতীতে যে বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয় তার কিছুটা ছাপ এখনও মৃগাঙ্কবাবুর চেহারায় রয়ে গেছে। চিন্তাটা তাঁকে বিব্রত করতে লাগল। আপিসে টাইপ করতে করতে মনে হয়— আমার মধ্যে বিবর্তন পুরো হয়নি, আমার মধ্যে খানিকটা বাঁদর এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে— বাঁদর কি আপিসে ডেস্কে বসে টাইপ করতে পারে? তাঁর চেহারার সঙ্গে বাঁদরের যেটুকু সাদৃশ্য সেটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। সেরকম তো অনেক লোকের চেহারার সঙ্গেই জানোয়ারের মিল আছে। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সুরেশবাবুর মুখের সঙ্গে তো ছুঁচোর আশ্চর্য সাদৃশ্য। মৃগাঙ্কবাবু ষোল আনাই মানুষ। এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও

কারণ থাকতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল হল যে তিনি কলা আর চিনেবাদামের বিশেষ ভক্ত। আপিস থেকে ফেরার পথে রোজই দুটোর একটা কিনে খান। আর এ দুটোই হল বাঁদরেরও প্রিয় খাদ্য। 'এই বাঁদর তুই কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?' —ছেলেবেলার এই ছড়াটা তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল। এই মিলটাও কি আকস্মিক? নিশ্চয়ই তাই। কলা তো অনেকেই খায়, আর চিনেবাদামও খায়। মৃগাঙ্কবাবু চিন্তাটা জোর করে মন থেকে দূর করে দিলেন।

কিন্তু যতই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করুন না কেন, মৃগাঙ্কবাবুর চিন্তাটা কিছুতেই যেতে চায় না। 'বাঁদর থেকে মানুষ...বাঁদর থেকে মানুষ...আমি কি তাহলে পুরোপুরি মানুষ হইনি? আমার মধ্যে কি বাঁদরত্ব খানিকটা রয়ে গেছে?'

টাইপিং-এ ভুল হতে লাগল, আর এবার মেজো সাহেবের কাছ থেকে ডাক পড়ল।

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?' মেজো সাহেব জিজ্ঞেস করলেন। 'আগে তো আপনার টাইপিং-এ ভুল থাকতো না। আজকাল এটা হচ্ছে কেন?'

মৃগাঙ্কবাবু আর কী বলবেন। বললেন, 'কদিন শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল স্যার।'

'তাহলে ডাক্তার দেখান। আপিসের ডাক্তার তো রয়েইছে। ডাঃ গুপ্তকে বলুন।'

'না স্যার। তার দরকার হবে না। আর ভুল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি। আমার ত্রুটি মাপ করবেন স্যার।'

মেজো সাহেব মৃগাঙ্কবাবুর কথা মেনে নিলেন, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু নিজে মনে শান্তি পেলেন না। তিনি ডাঃ গুপ্তের শরণাপন্ন হলেন। বললেন, 'আমায় একটা কোনও ওষুধ দিন তো, যাতে আমার অন্যমনস্কতা কিছুটা কমে। কাজে বড় অসুবিধা হচ্ছে।'

ডাঃ গুপ্ত মৃগাঙ্কবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনার চেহারাটাও দেখে ভালো লাগছে না। আপনার ওজন কমেছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে। শুধু ওষুধে তো কাজ হবে না। আপনার ছুটি পাওনা আছে?'

'তা আছে। আমি গত দু-বছর ছুটিই নিইনি।'

'তাহলে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। আপনার চেঞ্জের দরকার। অবিশ্যি আমি একটা ওষুধও লিখে দিচ্ছি, কিন্তু শুধু ওষুধে কাজ হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু দশ দিনের ছুটি নিলেন। কোথায় যাওয়া যায়?

কাশীতে তাঁর এক খুড়তুতো ভাই থাকেন। চৌষট্টি ঘাটের উপরেই বাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা গঙ্গার হাওয়ায় উপকার হবার সম্ভাবনা আছে। ভাই মৃগাঙ্কবাবুকে অনেকবার যেতে লিখেছেন, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মৃগাঙ্কবাবু কাশীই যাওয়া স্থির করলেন।

কাশীতে যে চতুর্দিকে এত বাঁদর সেটা মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল ছিল না। রাস্তায় ঘাটে বাড়ির ছাদে গাছের ডালে মন্দিরের গায়ে সর্বত্র বাঁদর। ভাই নীলরতনকে বলাতে তিনি বললেন, 'এখানে কী বাঁদর দেখছেন! চলুন আপনাকে দুর্গা বাড়ি দেখিয়ে আনি। বাঁদর কাকে বলে বুঝতে পারবেন।'

ভাইয়ের সঙ্গে দুর্গাবাড়িতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবুর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। ফটক দিয়ে চত্বরে ঢুকতেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁদর এদিক থেকে

ওদিক থেকে ছুটে এসে মৃগাঙ্কবাবুকে ঘিরে ধরল— তাদের কিচির মিচির শব্দে কান পাতা যায় না।

'দাঁড়ান—চিনেবাদাম কিনে আনি', বললেন নীলরতন।

আশ্চর্য এই যে বাঁদরের মধ্যে পড়েও মৃগাঙ্কবাবুর অসোয়াস্তি লাগছিল না। এসব বাঁদর যেন সকলেই তাঁর চেনা! অনেকদিন পরে বহু আপনজনের মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি।

মৃগাঙ্কবাবু দুর্গাবাড়িতে গিয়েছিলেন কাশী আসার তিন দিন পরে। পঞ্চম দিন তিনি প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি কথা বলার সময় খেই

হারিয়ে ফেলছেন। তাঁকে বার বার 'ইয়ে' বলতে হচ্ছে। অতি সহজ সাধারণ বাংলা কথাও তিনি ভুলে যাচ্ছেন। নীলরতন শুধু বলেছেন, 'মৃগাঙ্কদা, আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে ভালো কের্তন আছে। আমি আপিস থেকে ফিরে তোমায় নিয়ে যাব।' নীলরতন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

মৃগাঙ্কবাবুর কানে 'কের্তন' কথাটাও যেন কেমন অচেনা মনে হল। বললেন, 'কোথায় যাবার কথা বলছিস ?'

'দশাশ্বমেধ ঘাট। যাবে ?'

'ইয়ে—দশা-দশাশ্বমেধ ঘাট। কেন ? সেখানে কী আছে ?'

'বললাম যে— আজ সন্ধ্যায় ভালো কের্তন আছে। তোমার খুব ভালো লাগবে। তুমি তো কের্তনের খুব ভক্ত ছিলে।'

'ও—কের্তন। ইয়ে—তা যারা করবে কের্তন তারা মানুষ তো ?'

'এ আবার কী কথা মৃগাঙ্কদা— মানুষ ছাড়া কি বাঁদরে করবে নাকি কের্তন ?'

'ইয়ে— মানুষ তো মানে, এককালে বাঁদরই ছিল।'

'যাঃ, তুমি বড় আজে বাজে বকছ, মৃগাঙ্কদা। এ ধরনের রসিকতা ভালো লাগে না। আমি চলি আপিসে। সাড়ে পাঁচটায় এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

সন্ধ্যায় নীলরতনের সঙ্গে কীর্তন শুনতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবু একটা আশ্চর্য জিনিস অনুভব করলেন। তাঁর বার বার মনে হতে লাগল যেন বাঁদরের দলই খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইছে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

কীর্তন থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নীলরতন বললেন যে তার একবার মাধববাবুর কাছে যেতে হবে বাঙালিটোলায়।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসছি, মৃগাঙ্কদা। আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। উনি ডাক্তার— নিজেই ওষুধ বানিয়ে দেন।'

নীলরতন চলে যাবার পর মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পারলেন যে তাঁর একবার বাঁদরের মতো হেঁটে দেখতে ইচ্ছে করছে। খাটের পাশে মেঝের উপর উপুড় হয়ে সামনের হাত দুটোকে পায়ের মতো ব্যবহার করে মৃগাঙ্কবাবু ঘরে কয়েকটা চক্কর মারলেন। বার চারেক চক্কর খাবার পর ঘরের দরজায় চোখ পড়তে দেখলেন নীলরতনের চাকর রামলাল চোখ ছানাবড়া করে মুখ হাঁ করে চৌকাঠের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মৃগাঙ্কবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার পর রামলালের দিকে চেয়ে বললেন, 'ইয়ে— অত অবাক হবার কী আছে ? কাশীতে থাকিস আর

বাঁদর দেখিসনি কখনও ?

রামলাল কিছু না বলে ঘরে ঢুকে বিছানা করতে লাগল।

মৃগাঙ্কবাবু বাকি যে ক'দিন ছিলেন কাশীতে, সে ক'দিন প্রায় কথাই বলেননি। নীলরতন একবার বললেন, 'কী হল, মৃগাঙ্কদা— আপনি অমন চুপ মেরে গেলেন কেন ? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'শরীর-ইয়ে-কই শরীর তো ঠিকই আছে। মানে, আসলে-ইয়ে-বাঁদর থেকে মানুষ যেমন হয়—তেমনি মানুষ থেকেও বাঁদর— মানে, বিবর্তনের উল্টো আর কি।'

নীলরতন বেশ অবাক হয়ে গেলেন— যদিও খুলে কিছু বললেন না। মৃগাঙ্কদার মাথাটা ঠিক আছে তো ? একবার মাধব ডাক্তারকে দেখালে হত না ?

দুদিন পরে মৃগাঙ্কবাবু কলকাতায় ফিরে এলেন। হাতে সুটকেস নিয়ে হাজরা লেনে তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই সামনে চাকর দাশরথি পড়ল। পুরনো চাকর, এক গাল হেসে বলল, 'বাবু ফিরেছেন ? সব মঙ্গল তো ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হুপ্।'

দাশরথি হো হো করে হেসে বলল, 'কাশীতে খুব বাঁদর-না বাবু ? আমি একবার গেসলাম ছেলেবেলায়।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হুপ্।'

এই ঘটনার চারদিন পরে কলকাতার সব খবরের কাগজেই খবরটা বেরোল। চিড়িয়াখানার একজন কর্মচারী গতকাল ভোরে শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে মাটিতে একটি বানর শ্রেণী জীবকে পড়ে থাকতে দেখে। জানোয়ারটা ঘুমোচ্ছিল। বোধ হয় মাঝরাত্তিরে পাঁচিল টপকে ঢুকেছে। চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানিয়েছেন এই শ্রেণীর বানর আগে দেখা যায়নি। ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রণে যেমন নতুন জানোয়ার খচ্চরের সৃষ্টি হয়, এও হয়তো দুই শ্রেণীর বানরের সংমিশ্রণে সৃষ্টি একটি নতুন প্রাণী। প্রাণীটি বেঁচে আছে— এবং বানরের মতোই হুপ্ হাপ্ কিচির মিচির শব্দ করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে বাঁদরটির বাঁ হাতের অনামিকায় একটি আংটি পরানো— তাতে নীলের উপর সাদা দিয়ে মিনে করে লেখা ইংরিজি অক্ষর 'এম'।